IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের সামাজিক প্রেক্ষাপট

ড. সুকান্ত দাস
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ
দক্ষিণ বারাশত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

কুতুবউদ্দিন সেখ
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ
দক্ষিণ বারাশত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপঃ

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব ছিলেন একজন মহান ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক ও নীতিদার্শনিক। তাঁর প্রবর্তিত পঞ্চশীল ও ব্রহ্মবিহার নির্বাণলাভের উপায়। কিন্তু নির্বান হল আধ্যাত্মিকমার্গের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত বলা গেলেও তর্কের খাতিরে সকলেই নির্বানকামী হয় না। তথাপি বলা যায়, নির্বাণলাভের উপায় হিসাবে পঞ্চশীল তথা অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও ব্রহ্মবিহারের ভাবনার দ্বারা ভাবিত সাধারণ গৃহী ও শ্রমণদের মাধ্যমে সামাজিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিভাবে একজন থেকে দুইজন, দুই থেকে চার ও ক্রমশঃ সমগ্র সমাজ এই নৈতিক পথ অবলম্বনে আদর্শে পর্যবসিত হতে পারে ও বিভিন্নপ্রকারের সামাজিক ব্যাধি তথা হত্যা, চুরি, প্রতারণা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, দাঙ্গা প্রভৃতির মতো ঘটনাগুলি তিরোহিত হয়।

মূলশব্দ: পঞ্চশীল, ব্রহ্মবিহার, সামাজিক ব্যাধি, নির্বাণ, নীতিবিদ্যা।

ভূমিকাঃ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ সামাজিক জীবসমাজের মধ্যেই তার জন্ম, বিকাশ, ক্রিয়াকর্ম ও মৃত্যু মানুষকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজ হয় না তেমনি সমাজবিচ্ছিন্নভাবেও কোন মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব নয়। আদিম বর্বর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান অত্যাধুনিক সভ্যতার যুগ পর্যন্ত সর্বকালেই মানুষ কোন না কোন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে ও বেড়ে উঠেছে। শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা, চিন্তা, অনুভূতি ও আচার-ব্যবহার সবকিছুই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। এই সমাজ যদি আদর্শগতভাবে নীতির পরিপন্থী হয়, বিশৃঙ্খলযুক্ত হয় তাহলে সেই সমাজে বেড়ে ওঠা মনুষ্যকুলও বিকলাঙ্গ মানসিকতার গভীর অন্তর্ব্যূহে প্রবেশ করে। তাই প্রতিটি মানুষের সামাজিক জীব হিসাবে দায়িত্ব-কর্তব্য হল সমাজকল্যাণমূলক চিন্তা করা ও অনুরূপ কর্মের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। তাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'ছাড়পত্রে' উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন -

“চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ প্রাণপনে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি- নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার” ।

বিন্দু বিন্দু করে যেমন সিন্ধুর জলরাশি পরিপূর্ণ হয় তদনুরূপ কোন একটি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি নৈতিক সদাচারসম্পন্ন হয়, তবে কোন এক সময়ে সমগ্র সমাজ নৈতিকতার আদর্শে রূপান্তরিত হবে। বর্তমান সমাজে প্রতিনিয়তই খবরের কাগজ, টেলিভিশন আমাদের নৈতিক অধোগতির দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে কোন একটি সময় এ সমাজ সত্যিই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুস্থ ও স্বাভাবিক বাসযোগ্য থাকবে কি না এ প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। তবে, এক্ষেত্রে বৌদ্ধদর্শনের নৈতিক আদর্শ কিভাবে সমাজকে উৎকর্ষতার দিকে পরিচালিত করে তা দেখার চেষ্টা করা যাক।

প্রথম অধ্যায়

ইংরেজী 'এথিক্স' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'এথিকা' থেকে যার অর্থ হল - ‘রীতি-নীতি' বা অভ্যাস। ‘এথিক্স' শব্দটিকে আবার 'মরাল ফিলোজফি' বা নীতি-দর্শনও বলা হয়। 'মরাল' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘মোরেস' থেকে যার অর্থ হল প্রথা বা অভ্যাস। ম্যাকেঞ্জি এথিক্সের সংজ্ঞায় বলেন - "Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct".[১] 'কন্ডাক্ট' হচ্ছে চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ- তবে এক্ষেত্রে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের আচরণের প্রকাশকেই বুঝতে হবে। সুতরাং নীতিবিদ্যা হল চরিত্র বা আচরণসম্মত বিজ্ঞান। 'আচরণ' বলতে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মকেই বোঝায়। নীতিবিদ্যায় ‘ভালত্ব’, ‘মন্দত্ব’ উভয়ই নৈতিক। মিলের মতে সুখপ্রদানমূলক কাজ নৈতিক। কান্ট বলেন, সুখ নৈতিক আদর্শ নয়। ‘নৈতিক নিয়ম হল বিবেকের আদেশ। এই আদেশ অনুসারে, যে কাজ করা হয় তা নৈতিক। তা আসে আমাদের অন্তর থেকে, বাইরে থেকে নয়। তাই নৈতিক আদেশ আমরা মানতে বাধ্য। উইলিয়াম লিলি বলেন, "We may define ethics as the normative science of conduct of human beings living in societies- a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way".[২] বাংলা ভাষায় 'মর্যালিটি' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ‘নীতি' শব্দের প্রয়োগ হয়। বিভিন্ন অভিধান ও কোষ অনুসারে ‘নীতি' শব্দটি নিয়ম, অনুশাসন- বাক্য, হিতকথা ইত্যাদিকে বোঝায়। নীতি বা মর্যালিটি বলতে কি বোঝায় এক কথায় এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। এক অর্থে তবুও বলা যায় 'মর্যালিটি' বা নৈতিকতার স্বরূপ হল সহানুভূতি অথবা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। এই অর্থে আমরা একজনকে নৈতিক বলতে পারি তখনই যখন তার আচরণ ভাল বা যথার্থ হয় সমাজের নিরীখে। এই অর্থে ভারতীয় নীতিতত্ত্বের নির্দেশ হল আমাদের পাশবিক বৃত্তিকে দমন করে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হওয়া বা এমন আচরণ করা যা সমাজকল্যাণমূলক হয় বা যা আত্মিক উন্নতির সহায়ক হয়।

নীতিবিদ্যা সর্বদাই ‘আদর্শভিত্তিক'-এ কথার অর্থ হল 'যা ঘটা উচিত' যেমন, মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা কথা বলে এটি হল ঘটনা। কিন্তু মানুষের মিথ্যা পরিহার করা উচিত বা সত্য কথা বলা উচিত - এটি হল আদর্শ। নীতিবিদ্যা যেহেতু সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে সেহেতু সমাজে বসবাসকারী মানুষের ‘নৈতিক ভাবাবেগ' ও 'নৈতিক বাধ্যতাবোধ' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা, ‘নৈতিক বাধ্যতাবোধের ভিত্তিতেই একজন ব্যক্তি সুকর্ম করার ও দুষ্কর্ম না করার তাগিদ অনুভব করে। অপরপক্ষে, 'নৈতিক ভাবাবেগ' সৎকাজের জন্য প্রশংসা ও অসৎ কাজের জন্য তিরস্কার বা বিদ্রূপের কারণ হয়। এই আদর্শমূলক বিজ্ঞান হিসাবে নীতিবিদ্যা তাই শুধুমাত্র তত্ত্বেই সীমিত নয়, বাস্তবিক প্রয়োগেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরবর্তী পর্যায়ে এই নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তিতে কিভাবে বৌদ্ধদর্শনে সমাজকে আদর্শে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮০) মূলত ধর্ম ও নীতিসংস্কারক ছিলেন। তাঁর জীবনী ও বানীই বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ নীতিনীষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক ও দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর সমকালে যদিও ভারতীয় চিন্তার তত্বালোচনাই প্রাধান্য পেয়েছিল, তথাপি একজন তরতাজা যুবক সিদ্ধার্থ জগতের সকল মানুষের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের দ্বারা ব্যথিত হন এবং সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর দুঃখ-জ্ঞানের উপায় হিসাবে বোধিজ্ঞান (আর্যসত্যচতুষ্টয়ের) লাভ করে বুদ্ধ হন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি বলেন, শরবিদ্ধ মানুষের উচিত বিনা কালক্ষেপে শরটিকে দেহ হতে উৎপাটিত করা, তা না করে যদি কেউ শরটি কতদূর থেকে নিক্ষেপ করেছে এবং কতটা প্রবিষ্ট হয়েছে এই ভেবে সময় ব্যয় করে তাহলে তা মূর্খতার পরিচায়ক হবে। তদনুরূপ প্রতিটি মানুষই দুঃখক্লিষ্ট এবং তা থেকে মুক্তির উপায় অবলম্বন করে মুক্ত হওয়াই সঠিক কর্ম। তাই তাঁর মতের সারকথা হল- 'নিছক তত্বালোচনায় মানুষের জীবনে দুঃখনিবৃত্তি হয় না, শুধু নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমেই দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব'। তত্ত্ব যদি শুধুই পুঁথিবদ্ধ থাকে তাহলে তার মূল্য কি? তার ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকলে তবেই তা মূল্যবান। তিনি বরং এমন বলেন, বর্ণ, জাতি, ধনী, দরিদ্র, নারী, পুরুষ সকলেই দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্ত হতে পারে। সকলের মধ্যেই বুদ্ধত্বলাভের শক্তি বর্তমান। আকাঙ্ক্ষাকেই দুঃখের মূল কারণ হিসাবে উল্লেখ করে আর্যসত্যচতুষ্টয় ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে তা থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। আর্যসত্যচতুষ্টয় হল: ১। দুঃখ আছে, ২। দুঃখের কারণ আছে, ৩। দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব ও ৪। দুঃখনিবৃত্তির উপায় বা পথ আছে। দ্বিতীয় আর্যসত্যে দুঃখের কারণ হিসাবে তিনি 'অবিদ্যা' তথা 'চারটি আর্যসত্যের জ্ঞানের অভাবকে বর্ণনা করেন। শিষ্যদের বলতেন, "আর্যসত্যচতুষ্টয়ের জ্ঞান না থাকায় আমি এ যাবৎ জন্ম থেকে জন্মান্তরের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করেছি। এখন আর্যসত্যচতুষ্টয়ের জ্ঞান হওয়ায় পুনর্জন্ম গ্রহণের প্রবণতা (ভব) রুদ্ধ হয়েছে।[৩]

তৃতীয় আর্যসত্যে নির্বাণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বশেষে তথা চতুর্থ আর্যসত্যে নির্বাণলাভের উপায় হিসাবে যে আটটি মার্গের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি মধ্যপন্থাবিশিষ্ট হওয়ায় সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়েরই পালনযোগ্য। যার লক্ষ্য ছিল সমাজজীবনের প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক জীবনযাপন। এই আটটি মার্গ হল- ১। সম্যকদৃষ্টি অর্থাৎ আত্মা ও জগৎ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান। সর্বোপরি, চারটি আর্যসত্যের যথার্থ জ্ঞান। ২। সম্যকসংকল্প অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের আলোকে নিজের ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে, বৈরাগ্য ও মানবপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণসাধনের দৃঢ় ইচ্ছাই হল সম্যকসংকল্প। ৩। সম্যকবাক্ অর্থাৎ সত্যভাষণ, মিষ্ট, প্রিয় ও হিতকারীবাক্য। বিপরীত দিক থেকে মিথ্যাকথন, পরনিন্দা, বাচালতা প্রভৃতি হতে বিরত হওয়া। ৪। সম্যককর্মান্ত অর্থাৎ আচরণের নিয়ন্ত্রণ। ৫। সম্যগাজীব অর্থাৎ জীবনধারনের জন্য সৎ উপায় অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ করা। ৬। সম্যকব্যায়াম অর্থাৎ সদাই মন থেকে কুচিন্তা বর্জন করে সুচিন্তার অনুশীলন করা। ৭। সম্যকস্মৃতি অর্থাৎ চারটি আর্যসত্যের জ্ঞানকে সর্বদাই স্মরণে রাখা। ও ৮। সম্যক সমাধি অর্থাৎ জীবনে আর্য-সত্যগুলির সুপ্রতিষ্ঠা ও সফল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন সমাধির অভ্যাস। সমাধির চারটি স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম স্তরে বিচার- বিতর্কে থাকে ও মনে একপ্রকার আনন্দানুভূতি জাগ্রত থাকে। দ্বিতীয় স্তরে সমস্ত বিচার-বিতর্কের অবসান ঘটে ও সাধক এক দিব্য ও অনাবিল আনন্দের অধিকারী হয়। তৃতীয় স্তরে আত্মচেতনার সম্পূর্ণ বিলোপ না হলেও আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়। চতুর্থ স্তর হল তুরীয় অবস্থা। এ স্তরে সাধকের দৈহিক অনুভূতি, মানসিক চেতনা কোনকিছুই থাকে না। এ হল নির্বাণের স্তর, মুক্ত অবস্থা।

বুদ্ধদেব নির্দেশিত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে আবার 'শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা' রূপেও উল্লেখ করা হয়। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক স্মৃতি প্রজ্ঞা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিকে একত্রে বলা হয় সমাধি। 'শীল' কথার অর্থ হল 'সদাচারণ'। সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব ও সম্যক ব্যায়ামকে একত্রে বলা হয় 'শীল'।

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধমতে, 'সর্বং ক্ষণিকং সত্তাৎ । সর্বং অনিত্যম যৎ অনিত্যম তৎ দুঃখম্'। এই অর্থে নিত্য আত্মা বলেও কিছু নেই। কিন্তু ঐ প্রকার জানা মানুষকে জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। তাই সমস্ত দুঃখকে প্রতিহত করার জন্য নির্বাণলাভ প্রয়োজন। বৌদ্ধমতে নৈতিকতা অবলম্বন ছাড়া নির্বাণলাভ সম্ভব নয়। কিন্তু সকল মানুষ যে নির্বাণলাভে আগ্রহী হবে এমন কোন কথা নেই। তথাপি একথা বলা যায় যে, নির্বাণকে সামনে রেখে পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত বুদ্ধদেবের চারটি আর্যসত্যের ও শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার ব্যবহার প্রতিটি মানুষ তথা সমগ্র সমাজকে নৈতিক পথ অবলম্বনে উৎসাহিত ও পরিচালিত করে বইকি। এক্ষণে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে কিভাবে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা ও ব্রহ্মবিহার অবলম্বনে মানবসমাজ কিভাবে নৈতিক আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল মানুষকে শুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাবার পথ। নৈতিকতা ও দেহ-মনের বিশুদ্ধিতা ছাড়া কারো পক্ষেই আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন অমিতাচার পালন। এই অমিতাচার পালন সাধারণ মানুষকে সৎচরিত্র গঠনে সহায়তা করে। সৎচরিত্র গঠনকে তিনি শীল বলেছেন। সত্য, অহিংসা, সততা যে কোন মানুষেরই কাম্য হতে পারে।

'শীল' মাত্রই কেবল নেতিবাচক নয়, ইহা কখনও কখনও ইতিবাচক নির্দেশও দেয়। যেমন- নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শীল আমাদের নির্দেশ দেয় মৃষাবান-বিরতি (মিথ্যা না বলা)পিশুনবাদ-বিরতি (বিদ্বেষপরায়ণ বাক্য না বলা), পরুষবাদ-বিরতি (নিষ্ঠুর বাক্য না বলা), সংপ্রলাপ-বিরতি (বৃথাবাক্য না বলা)হিংসা না করা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, অসদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ না করা প্রভৃতি। অপরদিকে, সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইহার নির্দেশ হল- সত্য বলা, প্রিয়-হিতকর বাক্যপ্রয়োগ, সর্বজীবের প্রতি প্রেমপ্রদর্শন, ব্রহ্মচর্য পালন প্রভৃতি। বুদ্ধদেব মোট দশটি শীল পালনের নির্দেশ দিলেও গৃহীদের জন্য 'পঞ্চশীল' পালনই যথেষ্ট।

বুদ্ধদেব মোট দশটি শীল পালনের নির্দেশ দিলেও গৃহীদের জন্য 'পঞ্চশীল' পালনই যথেষ্ট। দশটি শীল হল- ১) অহিংসা, ২) অস্তেয়, ৩) সত্য, ৪) ব্রহ্মচর্য, ৫) সুরা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য বর্জন, ৬) অসময়ে আহার না করা, ৭) নৃত্যগীতাদি উৎসব বর্জন, ৮) দেহসজ্জার জন্য গন্ধাদি দ্রব্য ব্যবহার না করা, ৯) উচ্চ আসনে বসা বা শয়ন বর্জন ও ১০) অর্থগ্রহণ না করা।[৪] এই দশটি কেবল শ্রমনদের পালনীয়। প্রথম পাঁচটি-গৃহীর প্রতিদিন পালন করা কর্তব্য। উপাসনার দিনে অষ্টশীল পালনীয়।[৫] বুদ্ধদেব এই শীলসমূহকে কেবল নিজের পালন নয়, অপরকেও পালনে প্রবৃত্ত করার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি শীল পালন করেন তিনি পাপবিমুক্ত হন ও কোন কিছুতেই ভয় পান না'। বৌদ্ধধর্ম শীল পালন দ্বারা শারীরিক শুদ্ধির প্রখরতা বেশি থাকে তাই 'সমাধি'র মাধ্যমে অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযমের উল্লেখ করা হয় সম্যক্ ব্যায়াম অর্থাৎ চিত্তকে সর্বদা কুচিন্তামুক্ত রাখা ও সুচিন্তার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়। বাহিরের ও অন্তরশুদ্ধি উভয়ই পরস্পর সংযুক্ত। কোন মানুষের মানসিক শুচিতা ও নৈতিকতা যেমন তার কথায় ও কর্মে প্রকাশিত হয় তেমনই যদি কেউ অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকে তাহলে তার মানসিক প্রবৃত্তি দয়া, সততা, অহিংসা ইত্যাদিযুক্ত হয়।

প্রজ্ঞা তথা সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্পের ধারণা অনুসারে ব্যক্তি দৃঢ়চিত্তে অন্যান্য সকল শীল পালনের সংকল্প অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করে।

শুধু তাই নয়, বৌদ্ধধর্মে 'অহিংসা' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে 'সর্বপ্রাণীর প্রতি প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। 'সর্বপ্রাণীর' অর্থে মানুষ থেকে শুরু করে অতিক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির প্রতিও কায়-মনো-বাক্যে অহিংস হতে হবে। অহিংসার প্রশংসায় বুদ্ধদেব স্বয়ংই বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি জঙ্গম ও স্থাবর (উভয়বিধ)

প্রাণীগনের প্রতি দন্ড পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং যে প্রাণীকে স্বয়ং হনন করে না, (অপরকে নিয়াও) হনন করায় না, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি"।[৬]

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধদর্শনের মূল লক্ষ্য হল নির্বাণ। কারন, দুঃখত্রাতা ধন্বন্তরী বুদ্ধদেবের জীবনের মূলমন্ত্র বা উদ্দেশ্যই ছিল সকল মানুষকে দঃখমুক্তির পথ দেখানো ও চিরতরে দুঃখের উদ্‌চ্ছেদ ঘটানো। ইহা সম্ভব কেবল নির্বাণপ্রাপ্ত হলে। প্রশ্ন হতে পারে-সকল মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করতে চায়- একথা সত্য কিন্তু সকলেই কি নির্বাণলাভ করতে চায় ? যদি তা না হয় তাহলে এর সামাজিক গুরুত্ব কি ? অথবা নির্বাণলাভ সকলের হলে জগতে বংশধারা বা মানব অস্তিত্বের কি হবে ? তাছাড়া সকলেই যে আধ্যাত্মিক মননসম্পন্ন হবে এমন কোন কথা নেই। উত্তরে বলা যায়- এমন বলা সম্ভব নয় যে সকলেই নির্বাণলাভ করতে চায় বা সবার একই সময়ে নির্বানলাভ সম্ভব । যদি সকলের উদ্দেশ্য নির্বাণলাভ নাও হয় তথাপি এমন বলা যায় না যে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের কোন সামাজিক গুরুত্ব নেই । যদি কোন ব্যক্তি কেবল সাময়িক দুঃখনিবৃত্তির জন্য বা বুদ্ধদেবের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়েও তাঁর নির্দেশিতে পথ 'পঞ্চশীল' ও 'ব্রহ্মবিহার' পালন করে তার দৈনন্দিন জীবনে তাহলেও নির্বাণ ব্যতিরেকেই তার চিত্ত ও দেহ উভয়ই শুদ্ধ হবে এবং কর্ম (মানসিক, বাচিক ও দৈহিক) হবে নৈতিক ও সংযমপূর্ণ। যেমন প্রথম শীল অহিংসার নির্দেশ হল সবরকমের হিংসা থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও অপরকে প্ররোচনা না দেওয়া। বর্তমান সমাজে যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায় তার কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নিজে যেমন হিংসার সাথে জড়িত আবার কোন ক্ষেত্রে অপরকে প্ররোচিত করে হিংসামূলক কর্মের সাথে জড়িত। যদি এই শীল জীবনে কেউ পালন করে তবে সমাজ ক্রমানুসারে হিংসামুক্ত হবে। দ্বিতীয় শীল 'অস্তেয়' কথার অর্থ হল 'ন-স্তেয়' অর্থাৎ চুরি না করা। যদি এই শীল কেউ অনুসরণ করে তবে সমাজে কেউ কারো দ্বারা প্রতারিত হবে না বা চৌর্যবৃত্তিমূলক ঘটনারও নিবৃত্তি ঘটবে। তৃতীয় শীল হল সত্য। উপনিষদের মতো বৌদ্ধদর্শনেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- 'সত্যং বদ'। এখানে শুধু সত্য বলাই নয়, প্রীতিকর ও হিতকর বাক্যের প্রয়োগ করতে হবে। যদি বাক্যপ্রয়োগের ফলে কারও মানসিক আঘাত লাগে বা অনিষ্ট হয় তবে তা সত্য নয়। এমনকী পরনিন্দা, বাচালতা প্রভৃতিকেও সত্যের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়েছে।

চতুর্থ শীল 'ব্রহ্মচর্য' মানুষকে সংযত বা সীমিত কামের নির্দেশ দেয়। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার ফল হিসাবে সমাজ হবে ব্যভিচার ও অসংযত কামাচার হতে মুক্ত। পঞ্চম শীল হল সুরা-মাদকদ্রব্য প্রভৃতির বর্জন। মাদকাসক্তি একপ্রকার সামাজিক ব্যাধি। মাদকাসক্তি কোন ব্যক্তির বুদ্ধি, মানসিক চিন্তা ও বিবেককে কলুষিত করে, অকেজো করে। ফলে ঐ ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্নরকম অসামাজিক কার্য সম্পাদিত হয়। বৌদ্ধশীল অনুসরণ করলে ব্যক্তি তথা সমাজ এই সামাজিক ব্যাধি থেকে অনায়াসেই মুক্ত হয়। শীলের লক্ষণে বলা হয়েছে, 'সর্বপাপের অকরণই শীল'। কবি অশ্বঘোষ তাই বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রথম সাধন শীলের প্রশংসায় বলিয়াছেন, শীল ক্লেশসমূহের অংকুর উৎপন্ন হইতে দেয় না যেমন অতিবৃত্তকাল বীজসমূহের অংকুর উৎপন্ন হইতে দেয় না।[৭]

এছাড়াও ব্রহ্মবিহার পালনের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের সহিত গভীর আন্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মৈত্রী, করুনা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারটির একাগ্রচিত্তে ভাবনাকে বলা হয় ব্রহ্মবিহার।[৮] মৈত্রীভাবনাতে প্রতিষ্ঠার ফল হিসাবে আধিভৌতিক শান্তিলাভ হয়। সকল প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষ না থাকার ফলে সেও সকল প্রাণীর দ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহার সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীভাব আছে, তাহার প্রতি কাহারও বৈরভাব থাকে না। মৈত্রীর ন্যায় করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। করুণাভাবনা দ্বারা হিংসাবৃত্তি, মুদিতাভাবনার দ্বারা অরতি ও উপেক্ষাভাবনার দ্বারা প্রতিহিংসাবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়।[১০]

পঞ্চম অধ্যায়

সমালোচনা: উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদিও বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেননি তথাপি তাঁর মতাদর্শে বিশ্বাসী শিষ্যগণ তাঁর কথোপকথনকে 'ত্রিপিটকে' লিপিবদ্ধ করেন যেখান হতে তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায়। তিনি শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা ও ব্রহ্মবিহারের উপদেশের মাধ্যমে শুধু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী নয়, সাধারণ গৃহীকেও সৎচরিত্র গঠনের এক মহান পথের নির্দেশ দিয়েছেন।

হিংসাকে তিনি সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ করেছেন আবার কোথাও কোথাও দেখা যায় যে তিনি অহিংসবাদী হয়েও মৎস্য ও মাংসভোজন অনুমোদন করেছিলেন। এমনকী তিনি স্বয়ং নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে শূকরের মাংসভক্ষণ করেছিলেন। যেমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'লিচ্ছবীদিগের সেনাপতি সিংহের গৃহে নিমন্ত্রণে বুদ্ধ সশিষ্য মাংসভোজন করেছিলেন'।[১১] তাহলে প্রশ্ন হয়- এক্ষেত্রে স্বয়ং বুদ্ধদেবের মতবাদ স্ববিরোধিতার দোষে দুষ্ট নয় কি? উত্তরে বলা যায় যে, বুদ্ধ মাংসভোজনের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলার উপদেশ দেন। তিনি জীবনকে বলেন, 'জীবন! তিনপ্রকার মাংসকে আমি অভোজ্য বলি, দৃষ্ট ভূত এবং পরিশংকিত। জীবক! তিনপ্রকার মাংসকে আমি ভোজ্য বলি,- অদৃষ্ট, অশ্রুত এবং অপরিশংকিত"তাছাড়াও ভিক্ষু ঔষধার্থে প্রয়োজন হলে জানিয়া শুনিয়াও মৎস্য ও মাংসভোজন করিতে পারে।[১২]

যাই হোক, একথা খুবই সত্য যে, বুদ্ধদেব অহিংসবাদী হয়েও ক্ষেত্রবিশেষে মৎস্য ও মাংস এবং লতাপাতা, বৃক্ষ, গুল্মাদিরও প্রাণনাশ অনুমোদন করলেও তাকে স্ববিরোধী আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তিনি জ্ঞাতসারে বা ইচ্ছানুসারে ও অহেতুক প্রাণের হত্যাকে 'ঘোরপাপ' ও 'প্রায়শ্চিত্তমূলক কর্ম' বলেছেন।[১৩] ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম স্বীকার করে জীবনরক্ষার প্রয়োজন ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন।

মন্তব্য: আজকের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে, খুন, হিংসা, দ্বেষ, প্রতারণা, ধর্ষণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বৈষম্য, আত্মহত্যা, ডাকাতি, মাদকাসক্তি প্রভৃতি ঘটনা আজ নিত্যদিনের সঙ্গী। মানুষ মানুষকে কেবল রক্তমাংসবিশিষ্ট একটি প্রাণীস্বরূপ দেখছে, নিজের স্বার্থই শেষ কথা, ফলে এক ভাই অপর ভাইয়ের, সন্তান-পিতার, স্বামী স্ত্রীর প্রাণ নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা যায়, বুদ্ধদেব নির্দেশিত পথ এই স্বার্থপর পৃথিবীকে এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন। এ পথে রয়েছে সহযোগিতা, মৈত্রী, অহিংসা, প্রেম, সৌভ্রাতৃত্ব, সদিচ্ছা ও সংযমবিষয়-বাসনার তৃষ্ণায় মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ে ফলে তারা ধ্বংসলীলার পথে পা বাড়ায়। সেখানে নেই কোন ধর্ম, নীতি, শীল, প্রমা আছে কেবল অধর্ম, অন্যায়, ব্যভিচার। বুদ্ধদেব বলেন, "আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের মূল কারণ, তাকে বিনাশ করলেই আসে শান্তি"। তিনি জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ধনী-নির্ধন, ইতর-অভদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষকেই স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন 'আত্মদীপো ভব'। সকল মানুষের মধ্যেই বুদ্ধত্ব সুপ্তরূপে বিরাজমান। তাকে সদাচারণ পালনের দ্বারা জাগ্রত করতে হবে। স্বামীজীও তাই বুদ্ধের প্রশংসায় বলেছেন, "ভারতের সীমার মধ্যে এই মহাপুরুষের জীবন জাতিগঠনের প্রথম উপায়স্বরূপ হয়েছিল। উপনিষদ নিহিত আর্য শিক্ষা-দীক্ষাকে তিনি আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে সাধারণ ভারতীয় সভ্যতার যে একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তার দ্বারাই ভাবীযুগের অখণ্ড ভারতীয় মহাজাতির সূত্রপাত করেছিলেন"।[১৪] এমনকী বিবেকানন্দ নিজেকে 'বুদ্ধের দাসানুদাসদের দাস' বলে স্বীকার করেন ও নিবেদিতাকে বলেন, "যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচশত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন-সেই বুদ্ধকে অনুসরণ করো"।[১৫] শুধু নিবেদিতা নয়, বুদ্ধদেব নির্দেশিত শীল-সমাধি- প্রজ্ঞা, ব্রহ্মবিহার ও আর্যসত্যচতুষ্টয়ের পথ শুধু অতীতে বা বর্তমানেই প্রাসঙ্গিক ও অনুসরণীয় নয় ইহা ভবিষ্যতেও সমান প্রাসঙ্গিক থাকবে এই দাবী রাখাই যায়। কারণ, এখানে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের আদর্শ নিহিত।

তথ্যসূত্র

১। ম্যাকেঞ্জি , " A Manual of Ethics", পৃষ্ঠা -১

২। উইলিয়াম লিলি- "An Introduction to Ethics", New York City, 1901, 4th edition, পৃষ্ঠা ১-২

৩। এম. হিরিয়ান্না, "Outlines of Indian Philosophy", Motilal Banarsidass Pvt. Ltd. , Delhi, পৃষ্ঠা – ১৪৮

৪। দীপক কুমার বাগচী, 'ভারতীয় নীতিবিদ্যা', প্রগতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা -৪৫

৫। দীপক কুমার বাগচী, 'ভারতীয় নীতিবিদ্যা, প্রতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা, পৃ. ৬৫
৬। স্বামী বিদ্যারণ্য, 'বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, পৃ. ৮৪
৭। স্বামী বিদ্যারণা, 'বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, পৃ. ৭৫
৮। 'ব্রহ্মাণং সহব্যতায় মগ্গো ', দীঘনিকায়, তেবিজজসুত্ত ।
৯। ইতিবুত্থক- ২৭
১০। মজঝিমনিকায়, মহারাহুলোবাদসুত্ত (৬২) ১খ. ৪২৪ পৃ:
১১। স্বামী বিদ্যারণা, "বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা- ১৩,পৃ. ৮৬
১২। বিনয়পিটক, মহা বগ্গো, ৬/২/১, ৬/২/২
১৩। প্রায়শ্চিত্তবিধি, ১১, ৫২, ৬১ ও ৬২ মতে।
১৪। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃঃ ৪৯৬-৪৯৭
১৫। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা- ৯, পৃ: ৪৯৮